দর্শন ও প্রগতি, বর্ষ ৩৯ : ১ম ও ২য় সংখ্যা, জানুয়ারি-জুন, জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২২

প্রকৃতি ও নারী : একটি নীতি-দার্শনিক মূল্যায়ন

মন্দিরা চৌধুরী*

সারসংক্ষেপ

পরিবেশ নারীবাদ প্রত্যয়টি পরিবেশ দর্শন ও নারীবাদী দর্শন উভয় প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে বিবেচিত। পরিবেশ নারীবাদে প্রকৃতি ও নারী উভয়ের মাঝে সাদৃশ্যের বিষয়টি হলো এদের (প্রকৃতি ও নারী) প্রতি সংঘটিত নিপীড়ন। পরিবেশের প্রতি সংঘটিত নিপীড়নের মূলে রয়েছে প্রকৃতির প্রতি মানুষের কর্তৃত্ববাদী মানসিকতা তথা মানবকেন্দ্রিকতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। নারীর প্রতি সংঘটিত নিপীড়নের মূলে রয়েছে সমাজের কর্তৃত্ববাদী এবং প্রজাতিবাদী মানসিকতা তথা নারীর প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মানের অভাব। আলোচ্য প্রবন্ধে দর্শন ও নীতিবিদ্যার পরিমণ্ডলে প্রকৃতি ও নারীর প্রতি প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গির সীমাবদ্ধতা তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি এ সীমাবদ্ধতা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে একটি বৃহত্তর নীতি দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে – সম্প্রসারণমূলক, অর্ন্তভুক্তিমূলক সংবেদনশীল ও সমসাত্ত্বিক সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নারী ও প্রকৃতির প্রতি সম্মান, শ্রদ্ধা, সমতা ও ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার পথ অনুসন্ধান করা হয়েছে।

পরিবেশ নারীবাদ (Ecofeminism) পরিবেশ দর্শন এবং নারীবাদী দর্শনের একটি অপেক্ষাকৃত নতুনতর সংযোজন। পরিবেশ নারীবাদ পরিবেশ ও নারীদের মধ্যেকার আন্তঃসম্পর্কের বিশ্লেষণকে গুরুত্ব দেয় এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে নারীদের জীবনের সাদৃশ্য খুঁজে পায়। সাদৃশ্যের সূত্রটি হলো, পরিবেশ নারীবাদ মনে করে, পরিবেশ এবং নারী উভয়েই যথাক্রমে মানবকেন্দ্রিক এবং পুরষতান্ত্রিক সমাজ কর্তৃক অবদমনের স্বীকার। নারী ও প্রকৃতি উভয়েই উচ্চতর শক্তি কর্তৃক নিপীড়িত ও নির্যাতিত। পরিবেশ নারীবাদের নিপীড়নের সূত্রটিতে লক্ষ্য করা যায় ক্ষমতার অসম সম্পর্কের তীব্র আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণবাদী সংস্কৃতি। পরিবেশ নারীবাদের সংজ্ঞায়নে বিশিষ্ট পরিবেশ নারীবাদী দার্শনিক কারেন ওয়ারেন বলেন, পরিবেশ নারীবাদ এমন একটি অবস্থান যেখানে গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে– ঐতিহাসিক, অভিজ্ঞাতমূলক, প্রতীকী, তাত্ত্বিক দিক থেকে- নারীদের উপর কর্তৃত্ব এবং

* সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রকৃতির উপর কর্তৃত্বের মাঝে, এমন এক বোধগম্যতা যা নারীবাদ এবং পরিবেশ নীতিবিদ্যা উভয়ের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।[১] পরিবেশ দর্শন পরিবেশের ভাল-মন্দ বিচারকরণের দ্বারা পরিবেশকে নৈতিক বিবেচনার বিষয়বস্তু ও স্বতঃমূল্যে মূল্যবান মনে করে; তদ্রুপ পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধের (যা মূলত কর্তৃত্বপরায়ন ও নির্যাতনমূলক) বেড়াজাল ভেঙ্গে নারীবাদী দর্শন চেয়েছে পুরুষতান্ত্রিক সংস্কৃতির অবসান হোক, লিঙ্গ বৈষম্যভিত্তিক সমাজের পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্য ভেঙ্গে নারীর স্বতঃমূল্য, আত্মমর্যাদার দিকসমূহ প্রতিষ্ঠা লাভ করুক।

পরিবেশ নারীবাদে নিপীড়নের যে যৌক্তিকতা (Logic of domination)[২] লক্ষণীয় তাতে পরিবেশ ও নারীকে দেখা হয়েছে আবেগীয় ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক সত্তারূপে। সেখানে যুক্তি-বুদ্ধি কিংবা বস্তুগত (objective) দৃষ্টিভঙ্গি তাদের মাঝে অনুপস্থিত। বরং নারী মাত্রই বিষয়ীগত বা আত্মগত। তাই কোনো গঠনমূলক ও দূরদর্শী চিন্তনক্ষমতা নারী বৈশিষ্ট্যে বেমানান। অনুরূপভাবে, পরিবেশকেও নারীর ন্যায় নিষ্ক্রিয় আকারে দেখা হয়েছে যাতে পরিবেশ কেবল মানুষের স্বার্থ হাসিলের হাতিয়ার হবে; এর কোনো স্বতঃমূল্য কিংবা নিজস্ব অবস্থান নেই। বড় বিষয় হচ্ছে, পরিবেশ ও নারী উভয়কে নৈতিক মূল্যে বিবেচনার বিষয়বস্তু রূপে বিবেচনা করা হয় না। পরিবেশ ও নারীর প্রতি এ দৃষ্টিভঙ্গি কেবলমাত্র সামাজিক পরিমণ্ডলেই নয়, জ্ঞানের রাজ্যেও দৃশ্যমান। নীতিদার্শনিক আলোচনাতে আমরা লক্ষ্য করেছি বিমূর্ত বৌদ্ধিকতা এবং সার্বিকতার নীতিকে প্রাধান্য দিতে। প্রাকৃতিক আইনের প্রচলিত তত্ত্বসমূহ (যেমন এরিস্টটল, হবস, একুইনাস, লক প্রমুখের তত্ত্বসমূহ), উপযোগবাদ কিংবা পরিণতিমূলক নীতিবিদ্যা এরূপ বিবেচনার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।[৩]

আমার এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য পরিবেশ নারীবাদ সম্পর্কে একটি নীতি দার্শনিক মূল্যায়ন তুলে ধরা; যেখানে প্রচলিত নীতি দার্শনিক মতবাদসমূহের সীমাবদ্ধতা সংক্ষিপ্ত পরিমণ্ডলে উল্লেখিত হয়েছে এবং পরিবেশ নারীবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে একটি নৈতিক সমাধান অন্বেষণ করা হয়েছে।

ফরাসি নারীবাদী দার্শনিক ফ্রাসোঁয়া দো'বন (Francoised' Eaubonne) ১৯৭৪ সালে পরিবেশ নারীবাদ প্রত্যয়টির সূচনা করেন। তিনি তাঁর গ্রন্থে বাস্তুবিদ্যক বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন এবং তিনি মনে করেন মানব প্রজাতির টিকে থাকার জন্য অবশ্যই প্রয়োজন পিতৃতান্ত্রিক মানব সমাজের বাস্তুতন্ত্রের প্রতি সচেতনতার উপলব্ধি।[৪] তবে ফ্রাঁসোয়া দো'বন-এরও পূর্বে সিমন দ্যা বুভোয়ার এর লেখনীতে প্রকৃতি ও নারীর মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ে আলোচিত হয়েছে। তিনি তাঁর লেখনীতে তুলে ধরেন পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোতে কীভাবে নারী ও প্রকৃতির নিপীড়ন সমসূত্রে গ্রথিত।[৫]

পরিবেশ নারীবাদে কর্তৃত্ব এবং অধীনস্থতার এ সংস্কৃতি পিতৃতান্ত্রিক তথা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের একটি ধারণাগত কাঠামোরূপে কাজ করে। ধারণাগত এ কাঠামোর প্রকৃতি হলো নিপীড়নমূলক বা নির্যাতনমূলক। ধারণার এ নিপীড়নমূলক কাঠামোতে প্রকৃতি এবং নারীর প্রতি কাজ করে শোষণ করার এবং অধীনস্থ করে রাখার মানসিকতা। প্রকৃতির প্রতি মানব সমাজের যে আচরণ তাতে কাজ করে মানবকেন্দ্রিক মানসিকতা, যার ফলশ্রুতিতে সৃষ্টি হয় মানব স্বাজাত্যবোধ (Human chauvinism)। মানবকেন্দ্রিকতাবাদী মানসিকতার দরুন প্রকৃতির প্রতি মানুষের পরিপোষক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠার স্থলে কাজ করে প্রজাতিবাদী মানসিকতা। এতে প্রকৃতি ও সমাজ win-win অবস্থার পরিবর্তে loss-win অবস্থার মধ্যে দিয়ে যায়। প্রজাতিবাদী মানসিকতা মানুষের মাঝে তৈরি করে সৃষ্টিকূলের শ্রেষ্টত্বের বোধ। যাতে মানুষ নিজেকে ব্যতীত অপরাপর অ-মানব সত্তাকে স্বীয় স্বার্থে ব্যবহার অত্যন্ত স্বাভাবিকরূপে গণ্য করে। অবশ্য মানুষের মাঝে এরূপ স্বাজাত্যবাদী ধারণা সৃষ্টিতে পাশ্চাত্যের ইহুদী খ্রিস্টীয় ধর্মবিশ্বাসসমূহ সরাসরি দায়ী মনে করেন ঐতিহাসিক লিন হোয়াইট।[৬] যেমন - পাশ্চাত্যের ইহুদী-খ্রিস্টীয় ধর্মমতসমূহে বিশ্বাস করা হয় প্রকৃতিকে মানুষের আরাম আয়েশের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তাই মানুষ প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব করুক, বংশ বিস্তার করুক, স্বীয় সংখ্যা বৃদ্ধি করুক। লিন হোয়াইটের লেখনীতে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে পাশ্চাত্যের ইহুদী-খ্রিষ্টীয় ধর্মবিশ্বাসে মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ক একটি দ্বৈতবাদী ধারণার উপরে প্রতিষ্ঠিত। এ সকল ধর্মবিশ্বাসসমূহ প্রাচ্যের তথা প্রাচীন কালের সর্বপ্রাণবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে ধ্বংস করে প্রকৃতিকে মানুষের স্বীয় স্বার্থে ব্যবহারের জন্য অনুপ্রাণিত করেছে। লক্ষণীয় হলো, প্রকৃতিকে এ ব্যবহার কেবলমাত্র জীবন ধারণের নিতান্ত প্রয়োজনে সীমিত না রেখে ভোগ বিলাসের জন্য নির্দেশিত হয়েছে।

হোয়াইটের এ বক্তব্যের সাথে আমরা সাদৃশ্য পাই জন পাসমোরের ব্যাখ্যার। জন পাসমোর পরিবেশ নীতিবিদ্যার উপর তাঁর বহুল আলোচিত গ্রন্থ *Man's Responsibility for Nature*-এ সরাসরি অভিযোগ আনেন যে পাশ্চাত্যের প্রকৃতির প্রতি যে দৃষ্টিভঙ্গি তা তত্ত্বাবধানবাদী অপেক্ষা অধিকতর কর্তৃত্ববাদী।[৯] পাসমোর মনে করেন, 'পাশ্চাত্যে প্রকৃতিকে লালনযোগ্য সঙ্গী' (partner to be cherished) হিসেবে গ্রহণ না করে 'লুণ্ঠনযোগ্যবন্দী' (captive to be raped) হিসেবে দেখা হয়েছে।[১০]

প্রকৃতির প্রতি মানবকেন্দ্রিক এ দৃষ্টিভঙ্গির অনুরূপ প্রকাশ আমরা লক্ষ্য করি সমাজে-নারীর প্রতি। প্রকৃতির প্রতি মানুষের আচরণ যেমন প্রজাতিবাদী এবং মানব স্বাজাত্যবাদী একইভাবে নারীর প্রতি পুরুষতান্ত্রিক সমাজের আচরণও লিঙ্গবাদী। সমাজ আজও নারীকে মানুষের মর্যাদা দানের পরিবর্তে পুরুষ অপেক্ষা নিম্নতর সত্তারূপে বিবেচনা করে। প্রকৃতিকে

অধস্তন বিবেচনা করে এর প্রতি কর্তৃত্বকে মানবসমাজ যেরূপ বৈধতা দেয় তদ্রুপ নারীকে অধস্তন বিবেচনা করে তার প্রতি কর্তৃত্ব এবং শোষণকে পুরুষসমাজ অত্যন্ত স্বাভাবিকরূপে গ্রহণ করে বৈধতা দেয়। এভাবে নিপীড়নের সংস্কৃতি সমাজে বৈধতা লাভ করে এবং অনৈতিক বিধি-বিধানসমূহ স্বাভাবিক ও বৈধরূপে সমাজ স্বীকৃতি দেয়। পরিবেশ নারীবাদী দার্শনিক প্লামউড মনে করেন যে, পরিবেশকে যে কারণে অবহেলা ও উপেক্ষা করা হয় নারীকেও একই কারণে উপেক্ষা করা হয়। নারীবাদ পাশ্চাত্য দ্বৈতবাদের প্রবল প্রভাবকে এর জন্য দায়ী করে থাকে।[১১]

নিপীড়নমূলক ধারণাগত কাঠামো

প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং নারীর প্রতি মানবসমাজ এবং পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কর্তৃক প্রয়োগকৃত নিপীড়নের একটি কাঠামোগত রূপ আছে বলে মনে করেন কারেন ওয়ারেন। তিনি একে নাম দেন 'পিতৃতান্ত্রিক ধারণার নিপীড়নমূলক কাঠামো (oppressive patriarchal conceptual framework)'।[১২] ওয়ারেন তাঁর পূর্ববর্তী লেখনীতে যে ধারণাকে আধিপত্যের যৌক্তিকতা (Logic of domination) রূপে চিহ্নিত করেছেন তাঁকে পরবর্তীতে পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোর বৈশিষ্ট্যরূপে 'নিপীড়নমূলক' নামে সংযুক্ত করেন। ওয়ারেনের ধারণার নিপীড়নমূলক কাঠামোতে লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, সমাজ নিপীড়নের পিতৃতান্ত্রিক ধারণাগত কাঠামোকে শ্রেষ্ঠত্বের যুক্তি দ্বারা বিচার করে এবং বৈধতা দেয়। বৈধতা ও যৌক্তিকতা প্রদানের পশ্চাতে প্রকৃতি ও নারী উভয়ের ক্ষেত্রে নৈতিক ভিত্তিরূপে কাজ করে শক্তি এবং শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই।

ধারণাগত কাঠামো হলো সমাজসৃষ্ট প্রচলিত মূল্যবোধসমূহ যা মূলত পুরুষতান্ত্রিক। ধারণাগত কাঠামো ব্যক্তির মাঝে চশমার মতো কাজ করে। চশমা পরিহিত ব্যক্তি যেমন চশমার সাহায্যে একটি নির্দিষ্ট ফ্রেমের মাধ্যমে স্বীয় অবস্থা এবং পারিপার্শ্বিকতাকে বিচার করে, স্ব-সত্তাকে গড়ে তোলে, তদ্রুপ নিপীড়নমূলক ধারণাগত কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত এমন কতগুলো দিক রয়েছে যা অপরকে অধস্তন করে রাখা বা দাবিয়ে রাখার মতো অবস্থাকে যৌক্তিকতা দান করে। এ কাঠামো নারী এবং প্রকৃতিকে অধস্তন, দুর্বল, হীনরূপে উপস্থাপন দ্বারা প্রকৃতির প্রতি শোষণকে অত্যন্ত স্বাভাবিক বলে বৈধতা দান করে। অন্যদিকে, নারীকে হীনভাবে উপস্থাপন দ্বারা সেসব আদর্শকে যৌক্তিক বলে সমর্থন করে যেগুলো নারীর অবনত অবস্থার জন্য দায়ী।

কারেন ওয়ারেনের মতে, পাশ্চাত্যের জগতের ব্যক্তিক বিশ্বাস, মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি এবং ধারণাসমূহ এমনভাবে সজ্জিত যা মূলত পিতৃতান্ত্রিক ধারণার নিপীড়নমূলক কাঠামো

রূপে কাজ করে।[১৩] এ কাঠামো একদিকে প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর কর্তৃত্ব ও অধস্তনতার সংস্কৃতিকে বৈধতা দেয় এবং একই মানদণ্ডে বৈধতা দেয় পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর প্রতি সংঘটিত অত্যাচার ও শোষণকেও; পাশাপাশি পুরুষ কর্তৃক নারীর অধীনস্থতাকে ন্যায্যরূপে গণ্য করে।[১৪] ওয়ারেন ধারণাগত কাঠামো বলতে বুঝিয়েছেন এমন সব মৌলিক বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি যা ব্যক্তিকে সত্তা এবং স্বীয় বিশ্বাস সম্বন্ধে ধারণা গঠনে সহায়তা করে। উল্লেখ্য, ধারণাগত এ কাঠামো মানুষ জন্মগতভাবে নিয়ে আসে না, বরং এটি সমাজসৃষ্ট একটি কৃত্রিম ধারণা। এ কাঠামোতে নারী ও প্রকৃতিকে অধস্তন তাই শোষিত এবং পুরুষ ও মানব সমাজকে উর্ধ্বতন তাই শাসক ও শোষকরূপে দেখা হয়েছে। ধারণাগত কাঠামোর একটি স্তরায়িত প্রবণতা রয়েছে বলে আমি মনে করি। এ স্তরায়িত মূল্যবোধ নারীকে প্রকৃতির ন্যায় নিম্নস্তরের বা নিম্নশ্রেণি এবং পুরুষকে মানবসমাজের ন্যায় উচ্চতর শ্রেণি গণ্য করার মানসিকতা সৃষ্টি করে। স্তরায়িত মূল্যবোধ যে সমাজের অসম বিভাজনে ব্যাপক ভূমিকা রাখে তা আমরা লক্ষ্য করেছি মারে বুকচিনের সামাজিক বাস্তুবিদ্যার আলোচনায়। সমাজতাত্ত্বিক বুকচিনও মনে করেন, সামাজিক কর্তৃত্ব এবং প্রকৃতির উপর কর্তৃত্বের মাঝে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে।[১৫]

নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির নিরিখে প্রকৃতি ও নারী

এবার পিতৃতান্ত্রিক সমাজের নিপীড়নমূলক ধারণার কাঠামোগত দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিবেশ নারীবাদের নৈতিকতার আলোকে যাচাই করা যাক। ক্ষমতার এ কাঠামোতে অধস্তনতা ও নিপীড়নকে বৈধতা দানে ব্যবহৃত হয়েছে ক্ষমতা এবং দুর্বলতারূপে বিবেচিত হয়েছে প্রকৃতি ও নারীর সহ্যক্ষমতা। নারী ও প্রকৃতি হবে সর্বংসহা, ভীরু, প্রতিবাদহীন, পরনির্ভরশীল, পরতঃমূল্যের অধিকারী, জড়বৎ-অসাড়-নিষ্ক্রিয় সত্তা। তাই প্রদেয় যে কোনো আচরণ উভয়ের প্রতি যুক্তিসঙ্গত বলে ধরে নেয় সমাজ। শুধু সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, এ সকল বিষয়কে জ্ঞানের আলোচনায় অনেক ক্ষেত্রে স্বল্প গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয়। পরিবেশ দর্শনে কেবলমাত্র মানুষকে নৈতিকতার বিষয়রূপে গণ্য না করে অ-মানব সত্তা তথা প্রকৃতিকে নৈতিক বিবেচনার অন্তর্ভুক্ত করে নৈতিকতার পরিধিকে বিস্তৃত করেছেন আলডো লিওপল্ড তাঁর 'The Land Ethic' প্রবন্ধে (১৯৪৯)।[১৬] এ প্রবন্ধে লিওপল্ড কেবলমাত্র মানুষের পরিবর্তে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রতি মানুষের নৈতিক বিবেচনাকে প্রসারিত করার দাবি করেন, যা নীতিবিদ্যার পরিমণ্ডলে একটি প্যারাডাইম শিফট বলে দাবি করা যায়।[১৭] প্রচলিত বা সনাতনী নীতিবিদ্যাসমূহে কেবলমাত্র মানুষ নৈতিক বিবেচনার বিষয়বস্তুরূপে গৃহীত হতো। কিন্তু লিওপল্ডের ভূমি নীতিবিদ্যা মানুষের পাশাপাশি প্রাণ প্রকৃতির প্রতিও

মানুষের নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রত্যাশা করে, দাবি করে। ভূমি নীতিবিদ্যায় বাস্তুবিদ্যক উপলব্ধির মাধ্যমে মানুষ ছাড়াও প্রকৃতির অন্যান্য সত্তার প্রতি নৈতিক বিবেচনার যে দাবি লিওপল্ড করেন তা জ্ঞানের রাজ্যে এবং পরিবেশ দর্শনে এক নতুন সংযোজন।

প্রকৃতিকে মানুষ নিয়ন্ত্রণ করার দ্বারা স্বীয় শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করে। এর পেছনে মানুষের যুক্তি হলো প্রকৃতিজগত মানুষের মতো 'আত্মসচেতন' নয়। সনাতনী নীতিবিদ্যা অথবা দার্শনিক আলোচনাতেও আমরা লক্ষ করেছি যা কিছু আত্মসচেতনতার দাবিদার নয়, তার উপর কর্তৃত্ব করা যায়। পূর্ববর্তী নৈতিক বিবেচনায় দাবি করা হতো (লিওপল্ডের পূর্ব পর্যন্ত) কেবলমাত্র মানুষই নৈতিক দিক থেকে শ্রেষ্ঠ তাই মানুষের অন্য সব অ-মানব প্রাণী বা প্রকৃতির প্রতি কর্তৃত্ব করার যৌক্তিক অধিকার আছে। কিন্তু নৈতিক দিক থেকে এরূপ দাবি একপেশে। কারণ মানুষ অন্যান্য প্রাণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্বের আসনে আসীন বলেই সে মানুষ অনিবার্যভাবে অপর প্রাণীসত্তার প্রতি কর্তৃত্ববাদী বা মানবকেন্দ্রিক বা প্রজাতিবাদী আচরণ করতে পারে না। বরং মানব প্রজাতির সদস্য হিসেবেই মানুষের অন্যান্য সত্তার প্রতি সমআচরণ প্রদর্শনের একটি ধর্মীয় (যেমন - সনাতন ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম ইত্যাদি) কিংবা নৈতিক বাধ্যতা রয়েছে বলে মনে করি। তাছাড়া যদি শ্রেষ্ঠত্বের যুক্তিতে ও তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া হয়, তাহলেও আমাদের মনে রাখতে হবে যে শ্রেষ্ঠত্ব কেবল আধিপত্যকেই নির্দেশ করে না, কর্তব্যবোধেও আবদ্ধ করে।

দার্শনিক প্রেক্ষাপটে প্রকৃতি ও নারী

নৈতিকতা কেন্দ্রিক আলোচনার পর এবার আমরা লক্ষ্য করব দার্শনিক পরিমণ্ডলে প্রকৃতি ও নারী সম্পর্কে কিরূপ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করা হয়। রূঢ় হলেও সত্য, দর্শনের আলোচনায় প্রাচীন থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত প্রথিতযশা দার্শনিকবৃন্দের আলোচনাতেও আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রকৃতি ও নারী সম্পর্কে মর্যাদাপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করিনি। দার্শনিকবৃন্দের কেউ প্রকৃতি, কেউ নারী, কেউবা প্রকৃতি ও নারী উভয় সম্পর্কে নেতিবাচক বিশ্লেষণ দিয়েছেন। যেমন প্রাচীন দার্শনিকবৃন্দের মধ্যে প্লেটো, এরিস্টটল, মধ্যযুগে সেন্ট অগাস্টিন, সেন্ট টমাস একুইনাস কিংবা আধুনিক যুগে রেনে ডেকার্ট, ইমানুয়েল কান্ট প্রমুখ। এ সকল দার্শনিকবৃন্দের লেখনীতে প্রকৃতি সম্পর্কে মানবকেন্দ্রিকতাবাদী বিশ্লেষণ লক্ষ্যণীয়। যেমন *Republic* গ্রন্থে প্লেটো আদর্শ রাষ্ট্র, দার্শনিক রাজার প্রকৃতি আলোচনা করেছেন তাতে স্তরায়িত সমাজব্যবস্থা ও শিক্ষাব্যবস্থা স্পষ্ট। কারণ জ্ঞানের দিক থেকে দার্শনিকরাই উচ্চতর শ্রেণি এবং দার্শনিক রাজা রাষ্ট্র পরিচালনার উপযুক্ত।[১৮] আবার নারীদের সম্পর্কে প্লেটোর লেখনীতে মিশ্র অভিব্যক্তি পাওয়া যায়। মিশ্র অভিব্যক্তি কারণ, তিনি 'রিপাবলিক'

গ্রন্থে প্রাথমিকভাবে নারীর স্বাধীনতা ও সমতাকে স্বীকার করেছেন, নারীপুরুষের শিক্ষার সুযোগের সমতা প্রদানে আগ্রহী। আবার ক্ষেত্রবিশেষে প্লেটো নারীর অবস্থানকে সংকুচিত করেছেন।[১৯] যেমন 'টিমিয়াস' গ্রন্থে তিনি নারীদের সম্পর্কে অবজ্ঞাসূচক মত প্রকাশ করেছেন, যাতে তিনি নারীদের মূলত আবেগী ও দুর্বলরূপে চিত্রিত করেছেন।[২০]

এরিস্টটলের '*Metaphysics*' এবং '*Politics*' গ্রন্থসমূহে আমরা লক্ষ্য করেছি, তিনি প্রকৃতি ও নারীকে পুরুষদের তুলনায় নিম্নস্তরের মনে করেছেন এবং এদের মানুষ ও পুরুষের কর্তৃত্বাধীন রাখার যৌক্তিকতা তুলে ধরেছেন। তিনি পুরুষ ও নারীকে আকার (form) ও উপাদান (matter) রূপে বর্ণনা করেছেন, যেখানে পুরুষ সক্রিয় ও নারী নিষ্ক্রিয়। 'পলিটিক্স' গ্রন্থে এরিস্টটল বলেন যে, দেহের উপর আত্মার বা মনের নিয়ন্ত্রণ যেরূপ সঙ্গত তদ্রুপ নারীর উপর পুরুষের নিয়ন্ত্রণ, প্রকৃতির উপর মানুষের কর্তৃত্বও যুক্তিসঙ্গত।[২১] এরিস্টটলের আধিবিদ্যক ব্যাখ্যাসমূহ প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে লিঙ্গ বিভাজনের সাথে সম্পর্কিত তাই তাঁর রচনাসমূহকে পুরুষতান্ত্রিক (masculinist) বলে দাবি করেন ভিট।[২২]

সেন্ট অগাস্টিন তাঁর *'Confessions'* গ্রন্থে নারী ও পুরুষের মধ্যকার বৌদ্ধিক বিভাজনকে বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি মনে করেন, পুরুষদের উচিত নারীদের সঙ্গ এড়িয়ে চলা, নারীরা পুরুষদের তুলনায় শারীরিক এবং মানসিক দিক থেকে দুর্বল, নারীসঙ্গ পুরুষদের উচ্চ বৌদ্ধিকতা এবং নির্মল আত্মাকে কলুষিত করে। এমনকি অগাস্টিন নারী আত্মাকে পুরুষ আত্মা অপেক্ষা নিম্ন শ্রেণির মনে করেছেন।[২৩] একজন খ্রিস্টীয় ধর্মযাজক রূপে অগাস্টিনের এরূপ দ্বৈতবাদী দৃষ্টিভঙ্গি (যাতে আধ্যাত্মিক ও দৈহিকভাবে নারীকে হেয় করে চিত্রিত করা হয়েছে) নারী সম্পর্কে কেবল অবমাননাকর নয় ধর্মীয় সমতার দৃষ্টিকোণ থেকেও প্রশ্নসাপেক্ষ।

মধ্যযুগীয় স্কলাস্টিক দার্শনিক সেন্ট টমাস একুইনাসের প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রতি যে দৃষ্টিভঙ্গি তা সুস্পষ্টভাবে মানবকেন্দ্রিক। এক্ষেত্রে এরিস্টটলের সাথে একুইনাসের দৃষ্টিভঙ্গির সাযুজ্য রয়েছে। প্রকৃতির প্রতি মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির পেছনে একুইনাসের যুক্তি হলো মানুষ বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন সত্তা এবং সে নিজেই নিজের কাজের তত্ত্বাবধান করতে পারে। পক্ষান্তরে, অ-মানব প্রাণী তথা প্রকৃতি জগতের অন্যান্য প্রাণময় সত্তা যেমন উদ্ভিদ বা বৃক্ষরাজির কর্মকাণ্ডের উপর স্বীয় কর্তৃত্ব নেই।[২৪] তাই একুইনাসের বক্তব্যে এটি স্পষ্ট যে, কর্তৃত্ব পরায়ণতার ক্ষমতাই ব্যক্তিকে প্রভুত্ববাদী করে তোলে।

আধুনিক দর্শনের জনক ফরাসি দার্শনিক রেনে ডেকার্ট তাঁর '*Discourse On Method*' -এ মানুষকে প্রকৃতির প্রভু রূপে মনে করেছেন। ডেকার্ট মানুষকে অন্যান্য অ-মানব প্রাণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করেন এবং এ ব্যাখ্যায় তিনি দেহ-মন সম্পর্কিত দ্বৈতবাদী ধারণাকে ব্যবহার করেন। দেহ-মন সম্পর্কে ডেকার্টের দ্বৈতবাদী ধারণা দর্শনে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদ নামে পরিচিত। এ তত্ত্বে যেকোনো জড় পদার্থ যান্ত্রিক নিয়মে পরিচালিত হয়ে। এক্ষেত্রে ডেকার্ট একটি ঘড়ির দৃষ্টান্ত ব্যবহার দ্বারা দেহ-মন সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করেন। ডেকার্টের নিকট দেহ হলো যন্ত্র এবং মন হলো চালিকাশক্তি। ডেকার্ট মনে করেন, অ-মানব প্রাণী হলো যন্ত্রের ন্যায় কারণ তাদের আনন্দ-বেদনার অনুভূতি নেই, যুক্তি-বুদ্ধি ব্যবহারের ক্ষমতা নেই, এদের আত্মা নেই। তাঁর মতে, ঈশ্বর আত্মাকে কেবলমাত্র মানুষের মধ্যেই প্রবিষ্ট করেছেন। তাই মানুষের প্রভুত্বের অধিকার রয়েছে। ডেকার্টের এ বক্তব্য যে অসম্পূর্ণ তথা একদেশদর্শী তা বর্তমান দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক আলোচনায় বারংবার প্রমাণিত।

জ্ঞানের রাজ্যে ডেকার্টের দেহ-মন দ্বৈতবাদ পরিবেশ দর্শনে মানবকেন্দ্রিকতাবাদ ও প্রজাতিবাদী উভয়, দৃষ্টিভঙ্গিকে উস্কে দিয়েছে। এতে নারীকে দেহের সাথে এবং পুরুষকে মনের অধিকারী রূপে চিত্রিত করা হয়েছে। যাতে দেখানো হয়েছে নারী কেবল পরনির্ভরশীল আবেগী, চাবি দেয়া পুতুল; পক্ষান্তরে, পুরুষ স্বনির্ভর, আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন, স্বনিয়ন্ত্রিত সত্তা। পুরুষই নারীকে চালিত করে যেভাবে দেহ মন কর্তৃক চালিত হয়। প্রকৃতি ও নারী জ্ঞানের রাজ্যে বস্তু বা জড় বিষয় (object) তথা অচেতন সত্তা এবং পুরুষ হলো সচেতন সত্তা বা কর্তা (subject)। আধুনিকতা ও এনলাইটেনমেন্ট আবেগকে জ্ঞানের উৎস রূপে গণ্য করতে বাধা দেয় এবং বিষয় ও বিষয়ীর মাঝে সচেতন ও অসচেতন সত্তার অসম পার্থক্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করে।[২৬]

জ্ঞানালোক যুগের একজন দার্শনিক হওয়া সত্ত্বেও ইমানুয়েল কান্ট-এর নারী সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গিতে ইতিবাচকতা লক্ষ্য করা যায়নি বললে চলে।[২৭] কান্ট নারীদের চরিত্রকে সম্পূর্ণভাবে পুরুষের বিপরীত এবং প্রাকৃতিক প্রয়োজনের দ্বারা সংজ্ঞায়িত করেন। তিনি মনে করেন, নারী প্রকৃতিগতভাবে দুর্বল এবং ভীরু, কেবল মানসিকভাবেই নয়, শারীরিকভাবেও তারা জ্ঞানার্জন কিংবা পাণ্ডিত্যমূলক কাজের জন্য অনুপযোগী। তিনি উদাহরণস্বরূপ তাচ্ছিল্য করে বলেন, নারীদের গ্রন্থপাঠ বা বইয়ের ব্যবহার আসলে হাতে ঘড়ি পরার ন্যায়, অর্থাৎ শৌখিনতার বিষয়। যাতে সে অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে, কিন্তু প্রকৃত বিচারে সে ঘড়িটি ভাঙ্গা কিংবা সঠিক সময় নির্দেশ করে না।[২৮] নারীদের দর্শন চিন্তা তাঁর নিকট জ্ঞানভিত্তিক মনে হয়নি, তিনি বিষয়টিকে সেন্সনির্ভর গণ্য করেছেন।

একজন পরিণতিমুক্ত নীতিবিদ রূপে কান্টের এরূপ ভাবনা মানুষের প্রতি তাঁর সঠিক নীতি এবং বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধাচরণ এবং তাঁর নীতিদর্শনের মর্যাদার পরিপন্থী। তিনি আবেগের আশ্রয় গ্রহণ করে নারীদের উদ্দেশ্য নয়, উপায়রূপে দেখেছেন। কোনো কোনো নারীবাদী দার্শনিক মনে করেন, কান্টের নৈতিক নিয়মের আকারবাদী ধারণাটি প্রজ্ঞা ও প্রকৃতির মিথ্যা দ্বিকোটোমির উপর প্রতিষ্ঠিত।[২৯]

পূর্ববর্তী এ সকল দার্শনিকদের আলোচনাকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এক্ষেত্রে মানুষকে (পুরুষকে) শ্রেষ্ঠত্বের আসনে আসীন করা হয়েছে এবং নৈতিকভাবে মানব সম্প্রদায়কে শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদাররূপে গণ্য করা হয়েছে। এর পেছনে যুক্তিরূপে গ্রহণ করা হয়েছে মানুষের সচেতনতা ও বৌদ্ধিক সক্ষমতাকে (আবার এ সকল যুক্তিতে নারীকে অবনমিত করে দেখা হয়েছে)। মানুষ জগতের পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম। কারণ তার রয়েছে আত্মসচেতনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের সক্ষমতা। মানুষ স্বীয় শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করার মাধ্যমে প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তার করতে চায়। নৈতিকতা ও বৌদ্ধিকতার বিচারে মানুষ স্বীয় শ্রেষ্ঠত্ববোধের ধারণা দ্বারা অপরের উপর কর্তৃত্ব করার অধিকার দাবি করে। কিন্তু এরূপ ধারণা একটি ভ্রান্ত ধারণা। কারণ শ্রেষ্ঠত্ব কেবল অধিকারকেই নির্দেশ করে না, সে সাথে কর্তব্যবোধকেও নির্দেশ করে। শ্রেষ্ঠত্ব অবশ্যই দায়িত্ববোধকে যুক্ত করে। আর এই দায়িত্ববোধের বিবেচনায় মানুষের যেমন স্বীয় স্বার্থ সংরক্ষণ ও উপভোগের অধিকার আছে তদ্রুপ মানুষের এটাও কর্তব্য অন্যান্য প্রাণী ও প্রকৃতির অধিকারকে বিনষ্ট করে ভারসাম্য নষ্ট না করা। মানুষের প্রকৃত জ্ঞান ও বিচার ক্ষমতা তাকে এ শিক্ষা দেয় যে, সে কেবল নিজের জন্য বাঁচে না, অপরের জন্য সে কাজ করে এবং পরহিতার্থে কাজ করার প্রবৃত্তি মানুষকে অপরাপর প্রাণীর চেয়ে নৈতিক দিক থেকে ভিন্নতা দিয়েছে।

এ যাবৎ আলোচনায় আমরা লক্ষ্য করেছি প্রচলিত নীতিবিদ্যক তত্ত্বসমূহ কিংবা দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিসমূহ অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোনো হলিস্টিক (Holistic) বা সামগ্রিক মূল্যায়নের স্থলে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি সমুন্নত রাখতে মত দিয়েছে। এ প্রবন্ধে আমার উদ্দেশ্য নৈতিকতার এ ক্ষেত্রকে অধিকতর বিস্তৃত করা। একটি সমগ্রবাদী অবস্থান থেকে নারী বা পুরুষ নয়, মানবকেন্দ্রিক–অমানবকেন্দ্রিক নয় এবং মানুষ ও প্রকৃতির প্রতি সম্মান, শ্রদ্ধা, মমত্ব বা সহানুভূতি প্রদর্শিত হলে তা নিপীড়নমুক্ত ও স্তরায়নমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করেছি পরিবেশ দর্শনে লিওপোল্ড তাঁর ভূমি নীতিবিদ্যায় বাস্তবিদ্যক উপলব্ধির মাধ্যমে প্রকৃতির প্রতি নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত করার তাগিদ দিয়েছেন, যা বাস্তুতান্ত্রিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠায় এবং প্রাণ-প্রকৃতির বৈচিত্র্য সংরক্ষণে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, মানবকেন্দ্রিকতাবাদ মানুষের মাঝে যে অহংবোধ বা স্বজাত্যবাদী ধারণা তৈরি করে তা প্রকৃতি ও নারীকে অবদমন ও কর্তৃত্বের মূল্যবোধ সৃষ্টিতে সাহায্য করে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারীকে দুর্বল শ্রেণি ভেবে তার সম্পর্কে এরূপ ধারণা পোষণ করে। নারীকে নৈতিকভাবে দুর্বল সত্তারূপে গ্রহণ করে সামাজিক কাঠামো নারীকে নিপীড়নের বৈধতা দেয়। এরূপ একটি ভ্রান্ত ধারণার বহিঃপ্রকাশ ঘটে সমাজের কোনো শ্রেণি যখন মনে করে নারীর পোশাক কিংবা তার 'যথেচ্ছ' চলাফেরার জন্য নারী পুরুষ কর্তৃক নির্যাতিত হতেই পারে। অথচ একজন ব্যক্তি কর্তৃক অপরের স্বাধীনতা কিংবা অধিকারে হস্তক্ষেপ কেবল আইনগতভাবেই নয়, নৈতিকভাবেও অন্যায্য। এক্ষেত্রে ব্যক্তি স্বীয় আচরণ ইচ্ছার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে অপরের প্রতি আগ্রাসী-লোলুপ দৃষ্টি পোষণ করে।

নারীদের প্রতি সমাজের বিবিধ অবমাননাকর দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন তথা নারীর সুযোগের সমতা প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে নারীবাদীগণ আন্দোলন শুরু করেছিলেন। নারী-পুরুষের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা, সুযোগের সমতা নিশ্চিতকরণ, ক্ষমতায়ন ইত্যাদি দাবিতে লেখনী ধারণ করেন নারী মুক্তির অগ্রদূত মেরী উলস্টোনক্রাফট তাঁর *A Vindication of The Rights of Woman* (1792) গ্রন্থটির[৩০] দ্বারা। যদিও উলস্টোনক্রাফটের পূর্বেও নারীদের অধিকার, বঞ্চনার বিষয়সমূহ বিক্ষিপ্তভাবে হলেও আলোচিত হয়েছে ফরাসি রাজসভার সদস্য ক্রিস্টিন-দ্য-পিজার লেখনিতে। তিনি তাঁর *The Book of The City of Ladies* (1405) গ্রন্থে নারীদের সামাজিক অমর্যাদার চিত্রসমূহ তুলে ধরেন।[৩১] যা হোক, মেরী উলস্টোনক্রাফট কর্তৃক নারী মুক্তির লক্ষ্যে এ পথচলা কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না তা বলাই বাহুল্য। আঠারো শতকে ইংল্যান্ডে নারীদের সম্মান প্রতিষ্ঠায় উলস্টোনক্রাফটের গ্রন্থটি বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ করে টমাস টেইলর লেখেন *Vindication of the Rights of Brutes*। এ গ্রন্থে[৩২] টেইলর উল্লেখ করেন নারীদের অধিকার সুরক্ষায় যদি আন্দোলন করা হয় তাহলে পশুপাখিদের অধিকার আদায়ে কেন নয়। যদিও সাম্প্রতিককালের প্রাণী অধিকার সংরক্ষণকারীদের (যেমন– টম রিগ্যান, পিটার সিঙ্গার, বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন প্রমুখ) আন্দোলন টেইলরের এরূপ বক্তব্যের একটি দৃঢ় প্রতিবাদ। নারীর প্রতি পুরুষের বৈষম্যমূলক আচরণ কেবল স্বার্থের সমবিবেচনার নীতির পরিপন্থী কিংবা নৈতিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিকভাবে অগ্রহণযোগ্য নয়, পাশাপাশি এ ধরনের লিঙ্গবৈষম্য তথা প্রজাতিবাদী আচরণ আইনগতভাবেও আধুনিককালে বৈধ নয়।

পরিবেশ নারীবাদী দার্শনিক প্লামউড পরিবেশ নারীবাদের আলোচনায় বলেন পাশ্চাত্যের সমাজ মানুষ ও প্রকৃতি সম্পর্কে স্পষ্টতই দ্বৈতবাদী ধারণা পোষণ করে। জ্ঞানতাত্ত্বিক দিক থেকে এই দ্বৈতবাদ অধিকতর স্পষ্ট হয় বুদ্ধিবাদী ধারাতে। সমাজের

সবক্ষেত্রেই দ্বৈতবাদী অন্তর্জাল লক্ষ্য করা যায়। প্লামউডের মতে, "Western thought has given us a strong human nature dualism that is part of the set of interrelated dualisms of mind-body, reason-nature, reason-emotion, masculine feminine and has important interconnected features with these other dualism."[৩৩] অর্থাৎ প্রকৃতির সাথে মানুষের বন্ধন বিবেচিত হয়েছে বিপরীত এবং মূল্য দ্বৈতবাদ রূপে। প্রকৃতি এবং নারী বিপরীতক্রমে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। যেমন মানুষ প্রকৃতি দ্বৈতবাদ, নারী-পুরুষ দ্বৈতবাদ, প্রকৃতিকে মানুষ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা অবস্থানে রাখা হয়েছে, সে সাথে প্রকৃতিকে দেখা হয়েছে নিম্নতর এবং অনেক ক্ষেত্রে মানুষের সাথে বৈরী সম্পর্কের ধারক রূপে।

ওয়ারেন মনে করেন, সমাজ ব্যক্তির মাঝে কিছু বদ্ধমূল ধারণা চাপিয়ে দেয় এবং চাপিয়ে দেয়া এ সকল ধারণা ব্যক্তির মনে শক্তভাবে জেঁকে বসে। সমাজে লালিত পালিত অমর্যাদাকর সামাজিক আচার-আচরণ, বিধি নিষেধ আরোপ ব্যক্তির মনে এমন এক ধারণা জন্ম দেয় যা নারীর প্রতি বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি করে। নারী পুরুষের মধ্যেকার শারীরবৃত্তিয় পার্থক্য দ্বারা সমাজে ব্যক্তির ভূমিকা ও ব্যক্তিত্ব নির্ধারণ করা হয়। যেমন পুরুষের বৈশিষ্ট্যরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে শক্তি, কর্তৃত্ববাদী মানসিকতা, স্বাধীনচেতা, উদ্ধত, কঠোর, অহঙ্কারী, দুর্বিনীত, স্বনির্ভর, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ইত্যাদি। এসব গুণাবলীর সাহায্যে পুরুষের পৌরুষত্ব নির্দেশিত হয়েছে। বিপরীতক্রমে, নারীর বৈশিষ্ট্যরূপে চিহ্নিত হয়েছে কোমলতা, নম্রতা, মমতাময়ী, পরনির্ভরশীল, ভীরু, আবেগী, অন্তর্মুখী, সহ্যগুণসম্পন্ন ইত্যাদি। সমাজসৃষ্ট এ সকল গুণাবলীসমূহ দ্বারা কেবলমাত্র পুরুষ বা নারী বৈশিষ্ট্যের চিত্রায়ণ একপেশে ও পক্ষপাতিত্বমূলক।

নারীবাদী দার্শনিকদের আলোচনায় আমরা লক্ষ্য করেছি, তারা কীভাবে নারীর এবং মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় প্রচলিত নীতিবিদ্যাকে আরো অধিক মানবিক হওয়ার প্রস্তাব করেছেন। এক্ষেত্রে নারীবাদী মনোবিজ্ঞানী ক্যারল গিলিগানের পরিচর্যা নীতিবিদ্যা (Care Ethics)[৩৪], কারেন ওয়ারেনের পরিচর্যা-সংবেদনশীল নীতিবিদ্যা (Care-sensitive Ethics)[৩৫] তত্ত্বসমূহ অধিকতর যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছে।

পরিচর্যা নীতিবিদ্যার মূল বিষয় হলো কেবলমাত্র নিরেট যুক্তিবাদিতার স্থলে মানবিক আবেগ অনুভূতির নিরিখে ব্যক্তির অবস্থান ও কর্মকাণ্ডকে বিচার করা। গিলিগানের পরিচর্যা নীতিবিদ্যা কান্টের পরিণতিমুক্ত নীতিবিদ্যার (Deontological Ethics) বিপরীত প্রতিক্রিয়া বলে আমার মনে হয়েছে। কান্টীয় নীতিবিদ্যা কাজের ফল বা পরিণতি বিচার

না করে কেবল কর্তব্যের খাতিরে কর্তব্যের নীতিতে বিশ্বাসী। এ নীতিবিদ্যা দেহ-মন, আবেগ-অনুভূতি এবং বিচার-বুদ্ধি, নারী-পুরুষ– এ ধরনের সম্পর্কসমূহকে পরস্পর বিপরীত অবস্থানে প্রতিষ্ঠা করে। এ নীতিবিদ্যা মনে করে, কাজের সঠিক ফল প্রাপ্তির জন্য আবেগ নয়, বিচার বুদ্ধির সাহায্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। ব্যক্তির যথার্থ সিদ্ধান্ত হবে আবেগ বহির্ভূত। কিন্তু গিলিগান পূর্ব প্রচলিত এ সব মতকে একপেশে ও অসম্পূর্ণ দাবি করেন এবং এর স্থলে পরিচর্যা নীতিবিদ্যার কথা বলেন। তিনি নারীর বৌদ্ধিক ও মানসিক বিকাশ সম্পর্কে প্রচলিত মনোবিদ্যক ও নৈতিক মতসমূহকে সমালোচনা করে পরিচর্যা নীতিবিদ্যা নামক নারীবাদী নৈতিকতার প্রকাশ ঘটান। তাঁর অনুরূপ মত আমরা পাই ওয়ারেন উল্লিখিত নীতিবিদ্যায়। গিলিগান বা ওয়ারেন উভয়েই তাদের নীতিবিদ্যাকে কেবল নারী সমাজের জন্য প্রয়োগযোগ্য না করে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সমগ্র মানবসমাজের উপর প্রয়োগ করতে চান। এ নীতিবিদ্যার মূল বিষয় কেবল আবেগ বা কেবল যুক্তি নয়, বরং আবেগ, যুক্তি, মমত্ববোধ। গিলিগান, ওয়ারেন কর্তৃক প্রস্তাবিত নারীবাদী এ নীতিবিদ্যা সনাতনী নীতিবিদ্যার বিপরীত এক নতুন পদক্ষেপ যা অধিক অর্ন্তভুক্তি-মূলক, গভীর এবং বিশাল তথা সমগ্রতার অধিকারী। তাদের উল্লিখিত এ নতুন ধরনের নীতিবিদ্যা একটি অধিকতর মর্যাদাপূর্ণ, সংবেদনশীল, মানবিক সমাজ গঠনে সহায়তা করতে পারে বলে আমি মনে করি।

পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, উদার নৈতিকতা, প্রকৃত যুক্তিবাদিতা, অমানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ও পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার পরিবর্তন দ্বারা পুরাতন নিপীড়নমূলক মানসিকতার অপসারণ সম্ভব। ওয়ারেন মনে করেন, ধারণাগত কাঠামোকে ভাঙ্গার জন্য প্রয়োজন ব্যক্তির মমত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি ও অংশগ্রহণ। এ লক্ষ্যে তিনি সমাধান খুঁজেছেন তাঁর পরিচর্যা-সংবেদনশীল নীতিবিদ্যায়। তাঁর এ নীতিবিদ্যা অনেকাংশে গিলিগানের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সাযুজ্যময়। ওয়ারেন তাঁর নীতিবিদ্যায় আটটি শর্তের উল্লেখ করেছেন যা দ্বারা পিতৃতান্ত্রিক সমাজের নিপীড়নমূলক ধারণাগত কাঠামোর পরিবর্তন সম্ভব।[৩৬] ওয়ারেন প্রস্তাবিত নীতিবদ্যার বৈশিষ্ট্যসমূহ আমরা নিম্নোক্তভাবে চিহ্নিত করতে পারি–

i. এ নীতিবিদ্যা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মানুষের পক্ষে কথা বলে।

ii. নিপীড়নের যৌক্তিতার বিরুদ্ধাচরণ দ্বারা ওয়ারেনের নীতিবিদ্যা যেকোনো ধরনের বিশেষ মতবাদ যা নির্যাতনমূলক বা বৈষম্যমূলক তাকে অসমর্থন করে। যেমন এটি কোনো লিঙ্গবাদী, প্রজাতিবাদী বর্ণবাদী, প্রকৃতিবাদী, ক্লাসিজম বা অন্য কোনো মতকে সমর্থন করে না।

iii. ওয়ারেন কর্তৃক উল্লিখিত নীতিবিদ্যার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো এটি ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির সম্পর্কের সূত্রকে মূল্য দেয়, তাই এটি ব্যক্তির কোনো আচরণ বা কাজের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সামান্যীকরণ এর পরিবর্তে ব্যক্তির প্রেক্ষিতগত অবস্থানকে বিবেচনা করে। যেহেতু এখানে আবেগ এবং মমত্ববোধের বিষয়সমূহ জড়িত।

iv. যদিও এ নীতিবিদ্যা আবেগের প্রতি দৃষ্টি রাখে তবে লক্ষণীয় যে তার এ নীতিবিদ্যা অভিজ্ঞতানির্ভর ও তথ্য উপাত্তসমৃদ্ধ, পক্ষপাতদুষ্ট নয়। এ নীতিবিদ্যাতে রয়েছে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ আবার একই সাথে ভিন্নমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা। মতদ্বৈততা এখানে গ্রহণযোগ্য।

v. পরিবেশ নারীবাদী নীতিবিদ্যা কেবল বিষয়গত দিককে নয়, বিষয়ীগততাকেও গুরুত্ব দেয়। বিষয়ীগত দিককে বা আত্মগত দিককে গুরুত্ব দিতে গিয়ে তা কোনো পক্ষপাতিত্ব করে না। আবার পক্ষপাতমুক্ত থাকতে গিয়ে এটি পরিণতিমুক্ত নীতিবিদ্যার ন্যায় নির্লিপ্ত অবস্থান নেয় না। বরং এ নীতিবিদ্যা সে সকল দৃষ্টিভঙ্গি তথা কণ্ঠস্বর সমূহকে ধারণ করে যেগুলো অপেক্ষাকৃত দুর্বল বা ক্ষীণ।

vi. পরিবেশ নারীবাদী নীতিবিদ্যা গুরুত্ব দেয় ভালবাসা, বন্ধুত্ব, সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি, পারস্পরিক আস্থা এবং বিশ্বাসকে।

vii. এ নীতিবিদ্যা সত্যিকারের মানুষ এ ধারণাটিকে পুনঃসংজ্ঞায়ন করার মাধ্যমে নৈতিক সিদ্ধান্তসমূহের পুনর্বিবেচনা দাবী করে। অর্থাৎ একজন যথার্থ মানুষ অন্যান্য মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সংবেদনশীল। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যক্তির আপন বিচার-বুদ্ধির সাথে তার আবেগ-বিবেকের তাড়নাকেও যুক্ত করার তাগিদ দেয়।

viii. তাই এ নীতিবিদ্যা আবেগকে বাদ দিয়ে কেবল যুক্তিকে গ্রহণের পরিবর্তে ব্যক্তির বুদ্ধিমত্তা বা ধীশক্তিকে গুরুত্ব দেয়। অর্থাৎ ব্যক্তির যুক্তি এবং আবেগ উভয়ের সমন্বয়ে নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকে গুরুত্ব দেয়।

ওয়ারেন উত্থাপিত 'পরিচর্যা-সংবেদনশীল নীতিবিদ্যা' ক্ষেত্রে স্পষ্টত লক্ষণীয় সামাজিক মূল্যবোধের কাঠামোর পরিবর্তনে প্রয়োজন নৈতিক মূল্যবোধের কাঠামোর পরিবর্তন। এটা বলা যায়, যে ধারণাগত কাঠামো লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য সৃষ্টি করেছে সেরূপ কাঠামো আবার প্রকৃতি ও মানুষের মাঝে বৈষম্যকে জিইয়ে রাখে।

গিলিগান, ওয়ারেনের মতো রবিন ডিলনও মনে করেন, সম্মান প্রকৃতিগতভাবে আবেগশূন্য এমন বলা যাবে না, সম্মানের সাথে শ্রদ্ধা ও ভালবাসার অনুভূতিসমূহ স্বাভাবিকভাবেই যুক্ত হয়ে পড়ে।[৩৭] কান্টের সার্বিকতার ব্যাখ্যায় ব্যক্তির আবেগ অনুভূতির দিকটি উপেক্ষিত হয়েছে, কিন্তু এটাও সত্যি যে স্বীকৃতি, মূল্যায়ন এবং সম্মান কোনোটিই প্রকৃতিগতভাবে আবেগশূন্য নয়। ওয়ারেনের কনটেক্সচুয়াল বা পরিপ্রেক্ষিত নির্ভর নীতিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের সাহায্যে ব্যক্তিক আচরণ মূল্যায়ন করা হলে ব্যক্তির সমস্যাকে তা অধিকতর নিবিড় উপলব্ধিতে সহায়ক হবে। ওয়ারেন প্রকৃতি ও নারীকে ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে কান্ট বর্জিত ব্যক্তিক অভিজ্ঞতা দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছেন এবং বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতসমূহ বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে বিশ্লেষণ করেন। প্রচলিত নীতিবিদ্যায় নিয়মনীতির বিষয়ীগত দিকের পরিবর্তে বিষয়গত দিকের প্রতি যে গুরত্বারোপ করা হয়েছে তার বিপরীতে পরিবেশ নারীবাদী নীতিবিদ্যা বিষয়ীগত বা আত্মগত দিকটিকে গুরুত্ব দেয়। বিষয়ীগত বা আত্মগততার দিকটিকে গুরুত্বারোপ দ্বারা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা গুরুত্ব পায়। ব্যক্তিক অভিজ্ঞতার এ গুরুত্ব লক্ষ্য করা যায় উত্তম-পুরুষ (ন্যারেটিভ) বিবরণে। উত্তম-পুরুষ ন্যারেটিভ গ্রহণ করা হলে তা পীড়নমূলক ধারণাগত কাঠামোর যৌক্তিকতাকে ভেঙ্গে দিতে পারে। ওয়ারেন মনে করেন, উত্তম পুরুষ ন্যারেটিভ নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ তত্ত্ব নির্মাণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।[৩৮]

উপসংহার

পরিবেশ দর্শনের অমানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে পরিবেশ নারীবাদের সাদৃশ্য এখানে যে, উভয় পক্ষই অবদমন ও অধস্তন-নীতির বিরুদ্ধতা করে এবং উভয়েই নিপীড়নের যৌক্তিকতার বিরুদ্ধে কথা বলে। অমানবকেন্দ্রিকতাবাদীগণ মানুষের ন্যায় প্রকৃতিরও যে স্বতঃমূল্য আছে সে বিষয়টিতে গুরুত্ব দেন আর পরিবেশ নারীবাদীগণ নারীর স্বতঃমূল্য ও মানুষরূপে নারীর মর্যাদার প্রশ্নটিতে লড়াই করেন। তাই পরিবেশ নারীবাদ পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধ দ্বারা সৃষ্ট লিঙ্গ বৈষম্যের দ্বারা নারী ও প্রকৃতির উপর সংঘটিত অত্যাচার-নির্যাতন অবসানের লক্ষ্যে কর্তৃত্বপরায়ণ মানসিকতা ভাঙ্গতে চায়। সে সাথে আমি মনে করি, পরিবেশ নারীবাদের এ দর্শন বাস্তবায়ন কেবলমাত্র নারী ও প্রকৃতির মর্যাদা ও ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান প্রতিষ্ঠা করবে না, পাশাপাশি যেকোনো আধিপত্যবাদী ও স্তরায়িত মানসিকতা, দ্বৈতবাদী মূল্যবোধের অবসান ঘটানোর মাধ্যমে সমাজে বিরাজমান যেকোনো ধরণের নিপীড়ন যেমন ধনী-দরিদ্র, আদিবাসী-অধিবাসী, কৃষ্ণাঙ্গ- শ্বেতাঙ্গ দ্বন্দ্ব, ধর্মীয় (সংখ্যাগুরু-সংখ্যালঘু) সংঘাত অবসানে ভূমিকা রাখবে।

প্রবন্ধে সমাজে বিদ্যমান মূল্যবোধের যে পরিবর্তন প্রত্যাশিত তা কেবলমাত্র তাত্ত্বিক নয়, একইসাথে গুণগত। প্রকৃত অর্থে এ গুণগত পরিবর্তন সম্ভব হলে তা সমৃদ্ধ আগামীর দিকে মানব সমাজকে চালিত করবে। অন্যথায় প্রকৃতিবাদী, প্রজাতিবাদী অথবা লিঙ্গবাদী বৈষম্য ভবিষ্যতে আরো মারাত্মকভাবে ধর্মীয়, ভূ-রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক আগ্রাসনকে ঘনীভূত করবে। প্রকৃত নৈতিক মূল্যবোধ পুরুষ কর্তৃক নারীর অবদমন অথবা মানব সমাজ কর্তৃক প্রকৃতির অবদমনকে সমর্থন করতে পারে না। পুরুষ কর্তৃক নারীর প্রতি সমমর্যাদা এবং অধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়টি সম্ভব হলে তা গার্হস্থ্য জগত ও বহিঃজগত উভয়ক্ষেত্রেই নারীর অবস্থানের মানোন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হবে।

জাতিসংঘের মানবাধিকার সনদ, সিডো কনভেনশন বা বাংলাদেশের সংবিধানেও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে লিঙ্গভেদে কোনো বৈষম্য আইনের দৃষ্টিতে সমর্থিত নয়। যদিও বাংলাদেশ সরকার নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মানুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠায়, নারীদের ক্ষমতায়নে কাজ করে যাচ্ছে তবে এতে বৈষম্য, নির্যাতন বন্ধ হয়নি। এজন্য প্রয়োজন সামাজিক-রাজনৈতিক সচেতনতা তথা ব্যক্তির চেতনার পরিবর্তন।

কেবলমাত্র নারী শিক্ষার প্রসার কিংবা নারীর ক্ষমতায়ন নারী মুক্তির জন্য কিংবা নারীর সমতা প্রতিষ্ঠায় যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির গুণগত পরিবর্তন এবং নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের অংশগ্রহণে কাঠামোর বদল। রাষ্ট্রীয় বা রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডল নারীর ক্ষমতায়ন তথা অংশগ্রহণকে যদি নারী প্রগতির সূচক বিবেচনা করা হয় তবে তা যথেষ্ট নয় বলে মনে করি। নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের যৌক্তিক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ ক্ষমতা, ভোগ্যবস্তু কিংবা জড়বস্তুরূপে বিবেচনার পরিবর্তে মানুষরূপে নারীর মর্যাদা নিশ্চিতকরণ, নারীর মেধা ও যোগ্যতার স্বীকৃতি এ গুণগত পরিবর্তনে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। নারীর কেবল বাহ্যিক ক্ষমতায়নই নয়, পাশাপাশি অন্তঃপুরের নারীর প্রতি প্রকৃত নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং কর্তৃত্ববাদী তথা আধিপত্যবাদী মানসিকতার স্থলে স্বার্থের সমবিবেচনার নীতি, সামগ্রিক মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নারীর মর্যাদার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এভাবে একটি লিঙ্গ সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার সাহায্যে সামাজিক অস্থিরতা এবং বৈষম্যমুক্তি ঘটানো সম্ভব।

প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রতি মানুষের আগ্রাসী বা আধিপত্যবাদী মানসিকতার পরিবর্তন ঘটানোর দ্বারা এবং প্রকৃতির স্বতঃমূল্যের বিষয়টি স্বীকৃতিদানের মাধ্যমে মানুষ তার একচ্ছত্র স্বজাত্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গির অবসান ঘটাতে পারে। নারী-পুরুষ সম্পর্কের ন্যায় পরিবেশের প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিরও যে সামগ্রিক পরিবর্তন প্রয়োজন এ বিষয়ে পরিবেশ নারীবাদ জোর

দেয়। পরিবর্তনের এ ধারাতে প্রয়োজন মানুষের সাথে পরিবেশের পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়ার। প্রকৃতি ও নারীর প্রতি মানসিকতার পরিবর্তন প্রকৃতপক্ষে সমাজের স্তরায়িত মূল্যবোধের অবসানে সহায়ক হবে। এজন্য আরো প্রয়োজন মানবিক পরিবর্তন ও ব্যক্তিক উপলব্ধি।

তথ্যনির্দেশ

১. Karen J. Warren, "The Power and Promise of Ecological Feminism"; in *Environmental Ethics* 12 (Summer 1990), p. 126.

২. কারেন ওয়ারেন "Feminism and Ecology : Making Connections" প্রবন্ধে 'Logic of domination' পদটিকে তাঁর প্রথমদিকের লেখনীতে পিতৃতান্ত্রিক সমাজকাঠামোর বৈশিষ্ট্যরূপে ব্যবহার করেছেন।

৩. Joseph R. Des Jardins, *Environmental Ethics : An Introduction to Environmental Philosophy* (Belmont : Wadsworth Publishing Company, 2nd edition 1997), p. 240.

৪. Francoise d' Eaubonne, *Le feminisme ou la mort (Feminism or Death)*, (Paris: Pierre Horay, 1974), p. 221.

৫. Dini R., *An Analysis of Simone de Beauvior's The Second Sex* (London: Routledge, 2017), p. 114.

৬. Lynn White, "The Historical Roots of Our Ecological Crisis", in *Science,* vol. 155, March 1967, pp.155-59.

৭. *বাইবেল*, *আদিপুস্তক*, ধর্মপুস্তক (ঢাকা: পাকিস্তান বাইবেল সোসাইটি, ১৯৬৯), ১:১-২৫।

৮. Lynn White, *Op. Cit.* pp. 155-59.

৯. John Passmore, *Man's Responsibility for Nature* (London: Wadsworth, 2nd edition, 1980), pp. 8-27.

১০. কালীপ্রসন্ন দাস, *পরিবেশ দর্শন : মানবকেন্দ্রিকতাবাদ ও পরিপোষক উন্নয়ন* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১৪), পৃ. ৭১।

১১. রাশিদা আ. খানম, পরিবেশ নীতিবিদ্যা (ঢাকা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৯), পৃ. ৭৯।

১২. Karen J. Warren, *Op. Cit.*, pp. 126-127.

১৩. *Loc. Cit.*

১৪. Rosemarie Tong, *Feminist Thought : A More Comprehensive Introduction* (Colorado: Westview Press, 3rd edition, 2009), pp. 257-261.

১৫. Murray Bookchin, *The Ecology of Freedom* (Palo Alto Calif. : Chesire Books, 1982), pp. 243-248. Also see in details *The Philosophy of Social Eclogy* (Montreal : Black Rose Books, 1990).

১৬. Aldo Leopold, "The Land Ethic" in *Social Ethics : Morality and Social Policy* eds., Mappes T. A., Zembaty, J. S., Degrazia, Smith K. J., (NY: Mcgraw Hill, 8th edition, 2012), pp. 531-536.

১৭. Louis P. Pojman, *Global Environmental Ethics* (California : Mayfield Publishing Company, 2000), pp. 99-102.

১৮. R. L. Nettleship, *Lectures On the Republic of Plato* (London: Macmillan, 1963), pp. 170-173.

১৯. E. B. Cole and S. Coultrap-Mcquin, eds., *Explorations in Feminist Ethics: Theory and Practice* (Bloomington : Indiana University Press, 1992), pp. 58-59.

২০. Edith Hamilton and Huntington Cairns, eds., *The Collected Dialogues of Plato Including the Letters* (Princeton, NJ : Princeton University Press, 1961), pp. 875-90.

২১. Elizabeth V. Spelman, "Aristotle and the Politicization of the Soul," in *Discovering Reality ; Feminist Perspectives on Epistemology, Metaphysics, Methodology, and Philosophy of Science*, eds., Sandra Harding and Merrill B. Hintikka (Dordrecht/ Boston/Lancaster : D. Reidel, 1983), pp. 17-30.

২২. Charlotte Witt, "How Feminism is Re-writing the Philosophical Canon", The Alfred P. Stiernotte Memorial Lecture in Philosophy at Quinnipiac College, October 2, 1996, reprinted on SWIP-Web, pp. 4-5, http.//www.uh.edu/cfreelan/SWIP

২৩. *Soliloquia* 1.10.17, quoted in kari Elisabeth Borresen, *Subordination and Equivalence : The Nature and Role of Woman in Augustine and Thomas Aquinas*, tr. Charles H. Talbot,(Washington, DC : University Press of America, 1981), pp. 7-27.

২৪. Thomas Aquinas, *Summa Theologica*, tr. The Fathers of the English Dominican Province (New York : Benzinger Bros., 1947), vol. 1, part. 1, question 92, pp. 902-904.

২৫. Rene Descartes, "Animals are Machines" in selection reprinted in Tom Regan and Peter Singer, eds., *Animal Rights and Human Obligations* (New Jersy : Prentice Hall, 2nd edition, 1989), pp. 13-19.

২৬. রাশিদা আ. খানম, *নারীবাদ ও দার্শনিক প্রেক্ষাপট* (ঢাকা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০১১), পৃ. ৮৬।

২৭. Robin May Schott, "Feminism and the History of Philosophy" in *The Blackwell Guide to Feminist Philosophy*, Linda Martin Alcoff and Eva Feder Kittay, eds. (Cambridge : Blackwell Publishing, 2007), pp. 51-57.

২৮. *Ibid.,* p. 52.

২৯. Sally Sedgwick, "Can Kant's Ethics Survive the Feminist Critique?", in Schott, *Feminist Interpretations of Immanuel Kant*,(University Park : Pennsylvania State University Press, 1997), pp. 60-79.

৩০. এ সম্পর্কে আরো জানার জন্য দেখুন, মন্দিরা চৌধুরী, "মেরী উলস্টোনক্রাফট : নারী মুক্তির অগ্রদূত", *সমাজ নিরীক্ষণ পত্রিকা* নং ১৫১, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৯, ঢাকা : সমাজ

নিরীক্ষণ কেন্দ্র; আরও বিস্তারিত দেখুন Mary Wollstonecraft, *A Vindication of the Rights of Woman* (1792), (Buffalo : Prometheus Books, 1989).

৩১. Please see in details Christin de, Pizan, *The Book of the City of Ladies*, Richard J. trans (NY : Persea Books, 1982).

৩২. Please see in details Taylor Thomas, *Vindication of The Rights of Brutes* (London : Scholar's Facsimilies Reprints, 1966).

৩৩. Val Plumwood, "Nature, Self, and Gender: Feminism, Environmental Philosophy and the Critique of Rationalism" in *Environmental Ethics*, Robert Elliot, ed. (New York : Oxford University Press Inc, 1995), p. 195.

৩৪. Carol Gilligan, "In a Different Voice" in *Feminisms*, Kemp S. and Squires J., eds. (Oxford : Oxford University press, 1997), pp. 146-151.

৩৫. Karen J. Warren, *Op. Cit.,* pp. 126-27.

৩৬. Rosemarie Tong, *Op. Cit.,* pp. 237-243.

৩৭. "Feminist Conception of Self-Respect" in Robin S. Dillon, ed, *Dignity, Character and Self-Respect* (London : Routledge, 1995), pp. 290-301.

৩৮. রাশিদা আ. খানম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৪।